জেলহত্যা দিবসের স্মৃতিকথা

তোফায়েল আহমেদ

আজ থেকে ৪৭ বছর আগে ১৯৭৫-এর ৩ নভেম্বর কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে জাতীয় চার নেতাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল খুনিচক্র। '৭৫-এর ১৫ আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা ও ৩ নভেম্বরের জেলহত্যা একসূত্রে গাঁথা। মূলত আওয়ামী লীগকে নেতৃত্ব শূন্য করতেই সংঘটিত করা হয়েছিল এই নির্মম হত্যাকাÑ। প্রতি বছর জাতীয় জীবনে ৩ নভেম্বর ফিরে এলে জাতীয় চার নেতার-সর্বজনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী ও এএইচএম কামারুজ্জামান-আত্মত্যাগ জাতি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে তাঁরা বারবার আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব দিয়েছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধের রক্তঝরা দিনগুলিতে সফলভাবে নেতৃত্ব দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা। আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার পর থেকে মহান ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা করে বাংলার মানুষকে তিনি ঐক্যবদ্ধ করে জাতীয় মুক্তির মোহনায় দাঁড় করান। '৪৮ ও '৫২-এর মহান ভাষা আন্দোলন, '৫৪-এর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন, '৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন, '৬৬-এর ৬ দফা, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ও '৭০-এর নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বাংলার অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। পৃথিবীতে বহু নেতা এসেছেন এবং আসবেন; কিন্তু বঙ্গবন্ধুর মতো নেতা পৃথিবীতে আর জন্মগ্রহণ করবেন বলে মনে করি না। যে নেতা লক্ষ্য নির্ধারণ করে রাজনীতি করতেন এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে জেল-জুলুম-অত্যাচার ফাঁসির মঞ্চকে তুচ্ছ মনে করতেন। একবার চিন্তা-ভাবনা করে যে সিদ্ধান্ত নিতেন ফাঁসির মঞ্চে গিয়েও সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে যেতেন না। সেই মহান নেতার নেতৃত্বে আমরা মহান মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করেছি। পঁচিশে মার্চের শেষ রাত এবং ছাব্বিশে মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতা ঘোষণার পরপরই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালী কারাগারের নির্জন সেলে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছি আমাদের চিন্তা-চেতনা-ভাবনা সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু ছিল স্বাধীনতা।

যেদিন কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করা হয়, সেদিন আমি ময়মনসিংহ কারাগারে বন্দী। তখন দুঃসহ জীবন আমাদের! ময়মনসিংহ কারাগারের কনডেম সেলে-ফাঁসির আসামীকে যেখানে রাখা হয়-আমাকে সেখানে রাখা হয়েছিল। সহকারাবন্দী ছিলেন 'দি পিপল' পত্রিকার সম্পাদক জনাব আবিদুর রহমান। যিনি ইতোমধ্যে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে গেছেন। আমরা দু'জন দু'টি কক্ষে ফাঁসির আসামীর মতো জীবন কাটিয়েছি। হঠাৎ খবর এলো, কারাগারে জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করা হয়েছে। কারারক্ষীসহ কারাগারের সকলকে সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায় রাখা হয়েছে। ময়মনসিংহ কারাগারের জেল সুপার ছিলেন শ্রী নির্মলেন্দু রায়। চমৎকার মানুষ তিনি। কারাগারে আমরা যারা বন্দী ছিলাম তাদের প্রতি তিনি ছিলেন সহানুভূতিশীল। বঙ্গবন্ধুও তাকে খুব স্নেহ করতেন। বঙ্গবন্ধু যখন বারবার কারাগারে বন্দী ছিলেন, নির্মলেন্দু রায় তখন কাছ থেকে বঙ্গবন্ধুকে দেখেছেন। বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী হয়ে তাঁর পরম ¯েRহভাজন নির্মলেন্দু রায়কে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। সেদিন গভীর রাতে নির্মলেন্দু রায় আমার সেলে এসে বলেন, 'ময়মনসিংহের পুলিশ সুপার মিস্টার ফারুক-যিনি এখন প্রয়াত-আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এতো রাতে কেন? তিনি বললেন, 'ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আপনাদের চার নেতাকে হত্যা করা হয়েছে। আমরা কারাগারের চতুর্দিক পুলিশ দ্বারা বেষ্টন করে রেখেছি, জেল পুলিশ ঘিরে রেখেছে। এসপি সাহেব এসেছেন আপনাকে নিয়ে যেতে।' আমি বললাম, না, এভাবে তো যাওয়ার নিয়ম নেই। আমাকে যদি হত্যাও করা হয়, আমি এখান থেকে এভাবে যাব না। পরবর্তীতে শুনেছি সেনাবাহিনীর একজন মেজর সেদিন জেলখানায় প্রবেশের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু নির্মলেন্দু রায় বলেছিলেন, 'আমি অস্ত্র নিয়ে কাউকে কারাগারে প্রবেশ করতে দেবো না।' কারাগারের চারপাশে সেদিন যারা আমাকে রক্ষার জন্য ডিউটি করছিলেন তাদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগে আমার সহপাঠী জনাব ওদুদ-আমরা একসাথে এমএসসি পাশ করেছি এবং দেশ স্বাধীনের পর '৭৩-এ যিনি সহকারী পুলিশ সুপার পদে যোগদান করেন-নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কারাগার রক্ষার জন্য। আমি নির্মলেন্দু রায় এবং ওদুদের কাছে ঋণী।

'৭৫-এর ১৫ আগস্ট যেদিন জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করা হয়, আমরা সেদিন নিঃস্ব হয়েছিলাম। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাÑের পরপরই জাতীয় চার নেতাসহ আমরা ছিলাম গৃহবন্দী। পরদিন খুনিরা আমার বাসভবনে এসে আমাকে রেডিও স্টেশনে নিয়ে অকথ্য নির্যাতন করে। পরবর্তী সময়ে জেনারেল শফিউল্লাহ এবং প্রয়াত ব্রিগেডিয়ার শাফায়াত জামিল-তিনি তখন ঢাকার ব্রিগেড কমান্ডার-তাদের প্রচেষ্টায় রেডিও স্টেশন থেকে আমাকে বাড়ীতে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। মায়ের কথা খুউব মনে পড়ে। আমাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার সময় মা বেহুঁশ হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। মায়ের শরীরের উপর দিয়েই আমায় টেনে নিয়েছিল ঘাতকের দল। পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিআইজি জনাব ই এ চৌধুরী প্রয়াত রাষ্ট্রপতি শ্রদ্ধেয় নেতা জিল্লুর রহমান এবং আমাকে বঙ্গভবনে নিয়ে যান। সেখানে খুনি খোন্দকার মোশতাক আমাদের ভয়-ভীতি দেখান এবং বলেন, যদি তাকে সহযোগিতা না করি তাহলে তিনি আমাদের রক্ষা করতে পারবেন না। আমরা খুনি মোশতাকের সকল প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করি। ২২ আগস্ট জাতীয় চার নেতাসহ আমাদের অনেক বরেণ্য নেতাকে গ্রেফতার করে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়েছিল হত্যা করার জন্য। যে-কোন কারণেই হোক ঘাতকের দল শেষ পর্যন্ত হত্যা করেনি। পরে নেতৃবৃন্দকে কারাগারে নিয়ে

যাওয়া হয়। গৃহবন্দী অবস্থা থেকে একইদিনে আমাকে, জিল্লুর রহমান ও আবদুর রাজ্জাককে গ্রেফতার করে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের কোণে অবস্থিত পুলিশ কন্ট্রোলরুমে ৬ দিন বন্দী রেখে অমানুষিক নির্যাতন করা হয়। পুলিশ কন্ট্রোল রুম থেকে খুনিচক্র আমাকে রেডিও স্টেশনে নিয়ে চোখ ও হাত-পা চেয়ারের সাথে বেঁধে নির্মম নির্যাতন করে অর্ধমৃত অবস্থায় পুনরায় পুলিশ কন্ট্রোল রুমে রেখে আসে। পরদিন সিটি এসপি আবদুস সালাম ডাক্তার এনে আমার চিকিৎসা করান। পরে আমাকে ও আবিদুর রহমানকে ময়মনসিংহ কারাগারে এবং জিল্লুর রহমান ও রাজ্জাক ভাইকে কুমিল্লা কারাগারে প্রেরণ করা হয়।

ময়মনসিংহে কারারুদ্ধকালে জাতীয় চার নেতা হত্যাকাÑের দুঃসংবাদটি শুনেই মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান জাতীয় চার নেতার কতো অবদান। স্মৃতির পাতায় আজ সে-সব ভেসে ওঠে। দল পুনরুজ্জীবনের পর '৬৪তে আওয়ামী লীগের সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু পুনরায় সাধারণ সম্পাদক এবং তাজউদ্দীন আহমদ সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হন। '৬৬-এর ৫ ফেব্রÇয়ারি লাহোরে যে সর্বদলীয় নেতৃসম্মেলনে বঙ্গবন্ধু ছয় দফা উত্থাপন করেন, সেই সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর সাথে তাজউদ্দীন ভাই যোগদান করেন। বঙ্গবন্ধু ছয় দফা দেওয়ার পর ১৮, ১৯ ও ২০ ফেব্রÇয়ারি হোটেল ইডেনে আওয়ামী লীগের সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু সভাপতি, তাজউদ্দীন আহমদ সাধারণ সম্পাদক, সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রথম সহ-সভাপতি, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী অন্যতম সহ-সভাপতি এবং এএইচএম কামারুজ্জামান নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হওয়ার পর বঙ্গবন্ধুর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাজউদ্দীন আহমদ পরম নিষ্ঠার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। বঙ্গবন্ধু সারা বাংলাদেশে ছয় দফার সমর্থনে জনসভা করেন এবং যেখানেই যান সেখানেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ও তিনি জামিনে মুক্ত হন। অবশেষে ৮ মে, নারায়ণগঞ্জের জনসভা শেষে ধানমÑির বাসভবনে ফেরামাত্রই তথাকথিত 'পাকিস্তান রক্ষা আইন'-এ বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। বঙ্গবন্ধুর সাথে তাজউদ্দীন ভাইসহ আওয়ামী লীগের অসংখ্য নেতাকর্মী কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। এর প্রতিবাদে আমরা '৬৬-এর ৭ জুন হরতাল পালন করি। সফল হরতাল পালন শেষে এক বিশাল জনসভায় সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছয় দফা তথা বাঙালির স্বাধিকার কর্মসূচী বাস্তবায়নে বঙ্গবন্ধুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে ঐতিহাসিক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অনলবর্ষী বক্তা, তাজউদ্দীন আহমদ দক্ষ সংগঠক এবং কামারুজ্জামান সাহেব পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের এমএনএ হিসেবে পার্লামেন্টে প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণে বাঙালির স্বাধিকারের দাবী তুলে ধরতেন। '৬৮তে কারারুদ্ধ অবস্থায় তাজউদ্দীন ভাই আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক পদে পুনঃনির্বাচিত হন। '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের ফলশ্রÇতিতে তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পান। '৬৯-এর গণআন্দোলনের সময় দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ কারাগারে বন্দী ছিলেন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম বাইরে ছিলেন। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে মরহুম আহমেদুল কবীরের বাসভবনে উবসড়পৎধঃরপ অপঃরড়হ ঈড়সসরঃঃবব-সংক্ষেপে উঅঈ-এর-সভা চলছিল। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ১১ দফা দাবী নিয়ে জাতীয় নেতৃবৃন্দের কাছে গিয়েছিলাম। আমি যখন ১১ দফা কর্মসূচী ব্যাখ্যা করছি তখন ন্যাপ নেতা মাহমুদুল হক কাসুরি ১১ দফা কর্মসূচী সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে বলেছিলেন, 'তোমরা ১১ দফা কর্মসূচীতে শেখ মুজিবের ৬ দফা হুবহু যুক্ত করেছো। সুতরাং, তোমাদের ১১ দফা সমর্থনে প্রশ্ন আসবে।' উত্তরে বলেছিলাম, আমরা বাঙালিরা কিভাবে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হয় তা জানি। আপনারা সমর্থন না করলেও এই ১১ দফা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে প্রিয়নেতা শেখ মুজিবকে কারামুক্ত করবো। এ কথার পর সৈয়দ নজরুল ইসলাম আমায় বুকে টেনে পরমাদরে বলেছিলেন, 'তোমার বক্তব্যে আমি আনন্দিত ও গর্বিত।'

'৭০-এর ঐতিহাসিক নির্বাচনে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ এবং কামারুজ্জামান সাহেব পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে কে কোন্ পদে পদায়িত হবেন বঙ্গবন্ধু তা নির্ধারণ করেন। '৭০-এর নির্বাচনে আমি মাত্র ২৭ বছর বয়সে এমএনএ নির্বাচিত হই। '৭১-এর ২৩ ফেব্রÇয়ারি আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি পার্টির মিটিংয়ে বঙ্গবন্ধু জাতীয় পরিষদ নেতা, সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপনেতা, তাজউদ্দীন আহমদ পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা এবং কামারুজ্জামান সাহেব সচিব, চীফ হুইপ পদে জনাব ইউসুফ আলী এবং হুইপ পদে যথাক্রমে জনাব আবদুল মান্নান এবং ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম নির্বাচিত হন। আর প্রাদেশিক পরিষদে নেতা নির্বাচিত হন ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলে ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী হবেন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী। এজন্য মনসুর আলী সাহেবকে বঙ্গবন্ধু প্রাদেশিক পরিষদে মনোনয়ন দেন। এভাবেই বঙ্গবন্ধুর সেট-আপ করা ছিল। কিন্তু '৭১-এর ১ মার্চ পূর্বঘোষিত জাতীয় পরিষদ অধিবেশন একতরফাভাবে স্থগিত হলে বঙ্গবন্ধুর ডাকে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পর্ব। ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে সর্বাত্মক স্বাধীনতা ঘোষণার পর শুরু হয় অসহযোগের দ্বিতীয় পর্ব। বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতার নেতৃত্বে গঠিত আওয়ামী লীগের হাইকমান্ড সুচারুরূপে পরিচালনা করেছেন অসহযোগের প্রতিটি দিন। আমাদের প্রয়াত নেতা খুলনার মোহসীন সাহেবের লালমাটিয়াস্থ বাসভবনে বসে আমরা বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। অসহযোগ চলাকালেই বঙ্গবন্ধু ঠিক করে রেখেছিলেন আমরা কোথায় গেলে কি সাহায্য পাবো। '৭১-এর ১৮ ফেব্রÇয়ারি আমাদের চারজনকে-শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক এবং আমাকে-বঙ্গবন্ধু ডেকে পাঠালেন ধানমÑির ৩২ নম্বরে। সেখানে জাতীয় চার নেতাও ছিলেন। বঙ্গবন্ধু আমাদের বললেন, 'পড়ো, মুখস্থ করো।' আমরা মুখস্থ করলাম একটি ঠিকানা, 'সানি ভিলা, ২১ নং রাজেন্দ্র রোড, নর্দার্ন পার্ক, ভবানীপুর, কোলকাতা।' বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'এখানেই হবে তোমাদের জায়গা। ভুট্টো-ইয়াহিয়া ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। পাকিস্তানীরা বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা দেবে না। আমি নিশ্চিত ওরা আক্রমণ করবে। আক্রান্ত হলে এটাই হবে তোমাদের ঠিকানা। এখান থেকেই

মুক্তিযুদ্ধকে সংগঠিত করবে।' বঙ্গবন্ধু সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। সদ্য নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য চিত্তরঞ্জন সুতারকে তিনি আগেই কলকাতা প্রেরণ করেন। ডাক্তার আবু হেনা প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য। বঙ্গবন্ধু তাকে আগেই পাঠিয়েছিলেন অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে। সেই পথেই ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, কামারুজ্জামান সাহেব, মণি ভাই এবং আমাকে আবু হেনা নিয়ে গিয়েছিলেন। কোলকাতার রাজেন্দ্র রোডেই আমরা অবস্থান করতাম। আর ৮ নং থিয়েটার রোডে অবস্থান করতেন আমাদের জাতীয় চার নেতা। নেতৃবৃন্দের সাথে আমার নিয়মিত যোগাযোগ হতো। '৭১-এর ১০ এপ্রিল মুজিবনগরে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সমন্বয়ে 'বাংলাদেশ গণপরিষদ' গঠন ও সেই পরিষদে বঙ্গবন্ধুর 'স্বাধীনতার ঘোষণা' ও 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' অনুমোদন করে তারই ভিত্তিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ গঠন করা হয়। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং উপ-রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম। সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী অর্থমন্ত্রী এবং এএইচএম কামারুজ্জামান স্বরাষ্ট্র ও পুনর্বাসন বিষয়ক মন্ত্রী হিসেবে ১৭ এপ্রিল শপথ গ্রহণ করেন এবং অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে '৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর প্রিয় মাতৃভ‚মিকে হানাদার মুক্ত করেন। মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাজউদ্দীন আহমদ দূরদর্শীতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আমাদের সাথে পরামর্শ করতেন। আমাদের চারজনকে মুজিব বাহিনীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। আমাদের চার জনের কাজ ছিল প্রধানমন্ত্রীর সাথে বসে পরিকল্পনা গ্রহণ করা। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সাথে বর্ডারে বর্ডারে ঘুরেছি, রণাঙ্গনে ও মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে গিয়েছি, একসাথে কাজ করেছি। আমি থাকতাম কোলকাতায় মুজিব বাহিনীর হেড কোয়ার্টার ব্যারাকপুরে, মণি ভাই আগরতলায়, সিরাজ ভাই বালুর ঘাটে আর রাজ্জাক ভাই মেঘালয়ে। মেজার জেনারেল ওবানের নেতৃত্বে দেরাদুনে ছিল আমাদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। মুজিব বাহিনীর জন্য ভারত সরকারের যতো সাহায্য-সহযোগিতা সে-সব আমার কাছে আসতো। আমি আবার সেগুলো এই তিন নেতার কাছে পাঠিয়ে দিতাম। জাতীয় চার নেতার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে প্রিয় মাতৃভূমিকে আমরা স্বাধীন করেছি।

দেশ স্বাধীনের পর '৭১-এর ১৮ ডিসেম্বর কোলকাতা থেকে একটি বিশেষ হেলিকপ্টারে আমি এবং রাজ্জাক ভাই এবং ২২ ডিসেম্বর জাতীয় চার নেতা বিজয়ীর বেশে প্রিয় মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন। আর ৯ মাস ১৪ দিন কারারুদ্ধ থাকার পর পাকিস্তানের জিন্দানখানা থেকে মুক্ত হয়ে বিজয়ের পরিপূর্ণতায় জাতির পিতা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। '৭২-এর ১১ জানুয়ারি তাজউদ্দীন আহমদের বাসভবনে বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনা বিষয়ে সমস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু সংসদীয় গণতন্ত্রে ফিরে যাবেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হবেন বঙ্গবন্ধু স্বয়ং; সৈয়দ নজরুল ইসলাম শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী; তাজউদ্দীন আহমদ অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী; ক্যাপ্টেন মনসুর আলী যোগাযোগ মন্ত্রী এবং এএইচএম কামারুজ্জামান সাহেব ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল ১৪ জানুয়ারি প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হবার। সেই থেকে বঙ্গবন্ধুর কাছে থেকেছি শেষ দিন পর্যন্ত।

'৭৫-এর ১৫ আগস্ট খুনিচক্র বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে। খুনিদের নির্মমতা এমন ভয়ঙ্কর ছিল যে, তারা নিষ্পাপ শিশু রাসেলকেও হত্যা করেছে। বঙ্গবন্ধুর রক্তের উত্তরাধিকার যাতে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতে না পারে, সে জন্যই খুনিচক্র শিশু রাসেলকে হত্যা করে। কিন্তু তাদের লক্ষ্য পূরণ হয়নি। বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বিদেশে ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ কন্যার হাতে '৮১ সনে আমরা রক্তেভেজা আওয়ামী লীগের সংগ্রামী পতাকা তুলে দিয়েছিলাম। সেই পতাকা হাতে নিয়ে তিনি নিষ্ঠা-সততা-দক্ষতার সাথে সংগ্রাম করে দীর্ঘ ২১ বছর পর '৯৬তে আওয়ামী লীগকে গণরায়ে অভিষিক্ত করে সরকার গঠন করেন এবং অনেকগুলো যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেন। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সংবিধান থেকে কুখ্যাত 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ' অপসারণ করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পথ উন্মুক্ত করা। এরপর ২০০৯-এ সরকার গঠন করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের রায় ও দÑ কার্যকর করা। সফলভাবে এ দুটো ঐতিহাসিক কাজ সম্পন্নের সাথে সাথে তিনি বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক উন্নতির শিখরে নিয়ে গেছেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী ইতোমধ্যে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' স্বপ্ন থেকে বাস্তব রূপ লাভ করেছে। আমরা আজ উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হয়ে ২০৪১-এ 'উন্নত বাংলাদেশ' গঠনে বদ্ধপরিকর। করোনা অতিমারীতে বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দা অব্যাহত থাকা সত্তেiও দেশের কৃষি, শিল্প এবং সেবা খাতের অগ্রগতি ঘটছে। তবে ইউক্রেন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে বিশ্বব্যাপী যে জ্বালানী ও খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে তা আমাদের সকলকে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সাথে মোকাবেলা করতে হবে। জাতির পিতা ও জাতীয় চার নেতার আরাধ্য স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশের দুখী মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করে প্রিয় বাংলাদেশকে সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করা। মহান নেতাদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারলেই নেতৃবৃন্দের আত্মা শান্তি লাভ করবে এবং আমরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সেই লক্ষ্যেই নিয়োজিত।

#

পিআইডি ফিচার

লেখকঃ আওয়ামী লীগ নেতা; সংসদ সদস্য; সভাপতি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, জাতীয় সংসদ।